ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5
Volume- I, Issue-VI, July, 2025, Page No. 1339-1345
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.06W.138

রবীন্দ্র ছোটগল্পে কৈশোর চরিত্র: একটি বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা

অরুপ কুমার রায়, *রাষ্ট্রীয় সাহায্য প্রাপ্ত কলেজ শিক্ষক-১, বাংলা বিভাগ, আনন্দচন্দ্র কলেজ অফ্ কমার্স, জলপাইগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 21.07.2025; Accepted: 26.07.2025; Available online: 31.07.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Rabindranath Tagore is the father of short story. Throughout his life he has written numerous short stories. Rabindranath has arranged the subject of his short story, especially in Padmapara, with various images of nature, people, happiness and sorrow. Of the numerous short stories he composed, we find adolescent characters for some short stories. For example - Fatik in the story of ‘chuti’, Tarapad in ‘atithi’ story, Nilkant in the story of ‘Apad’, ‘Balai’ story, Ratan in the ‘Postmaster’ story, and mrinmoyi in the story of ‘samapti’. Rabindranath was young in the mind of the young man, so his discussion of the heart was revealed in the short stories of his discussion. The special feature of his illustrated adolescent characters is their freedom fantastic mindset and thrist for freedom. Besides, the characters include simplicity, compassion, affection, the ability to adopt others. Some of the characters are again rare in recognizing the bonds, love to recognize love. It is worth seeing the interests and curiosity of characters towards something new. Some of the characters are discussed in the article discussed. For example, we have found the ‘chuti’ story that we have a child of Rural Bengal. He grew up in rural environment, river banks, forests, jungles, open fields. He spent all day on the field. When such a fat is sent to Kolkata to study, the mischievous Fatik of ruralbangla cannot survive in the closed period of Kolkata, his spiritual death. Again, the character Tarapada in the story ‘Atithi’ is also a bond-averse person. No bond could bind her. He is like a puddle fish in the pak, escapes when he is caught. So, he left the house and joined the Panchali squad, could not stay there in the gymnastics squad, and then he left for the new one. The sapphire character of the ‘Apad’ story nilkanta is a very jealous boy. So, after the arrival of Satish in the world of Kiranmayi, thinking that the share of his love will be reduced, the Nilkanta mind world has been created in the world. In the story of ‘Balai’, the boy is the boyfriend of nature. There is no other short story by Rabindranath Tahore that contains such love for nature. From the love of nature, it feels sad and sad to break from the leaves of the vegetation. The character Ratan in the story of the ‘Postmaster’ moves our hearts with his love and affection. Ratan, an unlucky daughter the rural village of Banladesh. Whose life has revolved around Dadababu Postmaster, in the service of the postmaster. Again the ‘Samapti’ story is like a deer that is as playful as a baby. She does not understand what marriage is? What is love? So even after marriage, there is an attempt to break free from the bond, like a scene from an ‘Atithi’ story. But at one time, the childhood part of his life cycle fell into the earthen woman.

Keywords: Chuti, Atithi, Apod, Balai, Postmaster

রবীন্দ্র সাহিত্যে কৈশোর চরিত্রের ভূমিকা অবিসংবাদিত। চির তারুণ্য ছিল রবীন্দ্রনাথের মনে। তার নানা রচনায় হৃদয়ের সেই নবীনতা উৎসারিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ অঙ্কিত কৈশোর চরিত্রের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল

তাদের স্বাধীনতা মনস্কতা তথা মুক্তি পিয়াসা। এছাড়াও সারল্য তাদের চরিত্রের অলংকার, নিসর্গ প্রীতি এদের চরিত্রের সহজতাকে ব্যক্ত করেছে। চরিত্রগুলি বন্ধন ভিরু প্রকৃতির, ভালোবাসাকে স্বীকৃতি জানাতে এই চরিত্র গুলির তুলনা হয় না। নতুন জিনিসের প্রতি চরিত্রগুলির আগ্রহ, জিজ্ঞাসা ও কৌতুহল অপরিসীম রবীন্দ্র ছোটগল্পে কৈশোর চরিত্রের। এখানে কৈশোর শব্দটি বিশেষণ অর্থে ব্যবহৃত অর্থাৎ ছেলেমেয়ে উভয় ক্ষেত্রেই বোঝায়। বাংলা সাহিত্যে কিশোর চরিত্র আর পূর্ণাঙ্গ কিশোর সাহিত্য এই দুইয়ের মধ্যে জাত গোত্রগত তফাৎ থাকলেও স্বভাব ধর্মে যথেষ্ট মিল আছে। বিশেষ করে কৈশোরের মনস্তত্ত্ব চিত্রনে বিষয়টি উভয় ক্ষেত্রেই জরুরী। বাংলা সাহিত্যে কিশোর চরিত্রের ছড়াছড়ি। তারা কেউ শান্ত, কেউ দুর্দান্ত, কেউ স্বপ্ন রাজ্যে বিচরণ করে আবার কেউবা দুঃসাহসিক অভিযানে উৎসুক। শিশু থেকে কিশোর হয়ে ওঠার আনন্দ, বেদনা, স্বপ্ন, সমস্যা সবকিছু নিয়েই কিশোর চরিত্র সাহিত্য সভার উল্লেখযোগ্য কুশীলব। সুকুমার রায়ের পাগলা দাশু, লীলা মজুমদারের নটবর, সৌরেন্দ্র মোহনের চন্দর কিংবা সত্যজিৎ রায়ের ‘ফেলুদা সিরিজ’ এর তোপসে ও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের টেনিদা এবং তার পটলডাঙ্গার কিশোর কাহিনী আমাদের সকলেরই দারুন প্রিয়। আসলে বড় হয়ে গেলেও ফেলে আসা কৈশোরের প্রতি আমাদের টান থেকেই যায়। রবীন্দ্রনাথ তাই বালক কবিতায় আক্ষেপ করে বলেছেন-

> “আমিও ছিলেম একদিন ছেলেমানুষ।
> আমার জন্যও বিধাতা রেখেছিলেন গড়ে
> অকর্মন্যের অপ্রয়োজনের জল স্থল আকাশ।
> তবু ছেলেদের সেই মস্ত বড় জগতে
> মিলল না আমার জায়গা।”[১]

রবীন্দ্রনাথের ‘ছুটি’ গল্পের ফটিক বয়ঃ সন্ধিকালের কিশোর। এই বয়ঃ সন্ধিকাল সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব বক্তব্যটি ও প্রণিধানযোগ্য-

> “তেরো-চোদ্দ বছরের ছেলের মতো পৃথিবীর এমন বালাই আর নাই। শোভাও নাই, কোন কাজেও লাগেনা। স্নেহও উদ্রেক করে না, তাহার সঙ্গসুখও বিশেষ প্রার্থনীয় নহে। তাহার মুখে আধো আধো কথাও ন্যাকামি, পাকা কথাও জ্যাঠামি এবং কথা মাত্রই প্রগলভতা। হঠাৎ কাপড়চোপড়ের পরিমাণ রক্ষা না করিয়া বেমানান রূপে বাড়িয়া উঠে, লোকে সেটা তাহার একটা কুশ্রী স্পর্ধা স্বরূপ জ্ঞান করে। তাহার শৈশবের লালিত ও কণ্ঠস্বরের মিষ্টতা সহসা চলিয়া যায়, লোকে সেজন্য তাহাকে মনে মনে অপরাধ না দিয়া থাকিতে পারে না। শৈশব ও যৌবনের অনেক দোষ মাফ করা যায় কিন্তু এই সময়ের কোন স্বাভাবিক অনিবার্য ত্রুটিও যেন অসহ্য বোধ হয়।”[২]

শৈশব ও যৌবনের মধ্যবর্তী সময়টা যেন ভয়ঙ্কর রকমের বাদুড়ে। বাদুড় জন্তুও নয়, পক্ষীও নয়। অথচ দুটি শ্রেণীর আধা-আধি বৈশিষ্ট্য তার মধ্যে বর্তমান। ‘ছুটি’ গল্পের ফটিক পল্লীগ্রামের দামাল শিশু। বন জঙ্গল, খোলা আকাশ, নদীর তীর, ঝিল্লির ডাক এসব নিয়েই যে পল্লী প্রকৃতি, ফটিক সেই পল্লীপ্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য এক অঙ্গ। তবে এক সময় লেখাপড়ার জন্য তাকে পাঠানো হয় কলকাতায়। যেখানে পথ হারিয়ে যায় অন্ধ গলির ঘুরপাকে। তাই কলকাতা শহরের নতুন এসে ফটিক চার দেওয়ালের ছোট্ট ঘেরাটোপে বন্দী হয়ে স্মৃতির পাতা হাতড়ায়। তার মনে পড়ে যায়-

> “প্রকাণ্ড একটা ধাউস্ ঘুড়ি লইয়া বোঁ বোঁ শব্দে উড়াইয়া বেড়াইবার সেই মাঠ, তাইরে নাইরে না করিয়া উচ্চস্বরে স্বরচিত রাগিনী আলাপ করিয়া অকর্মণভাবে ঘুরিয়া বেড়াইবার সেই নদীতীর, দিনের মধ্যে যখন তখন ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া সাঁতার কাটিবার সেই সংকীর্ণ স্রোতস্বিনী, সেই সব দলবল, উপদ্রব, স্বাধীনতা এবং সর্বোপরি সেই অত্যাচারিণী-অবিচারিনী মা অহর্নিশি তাহার নিরুপায় চিত্তকে আকর্ষণ করিত।”[৩]

কলকাতায় মামার সংসারে ফটিক নিতান্ত পরগাছা। মামীর স্নেহশীল চোখে ফটিক অনাবশ্যক এক বোঝা। যেন বৃন্ত থেকে ছিনিয়ে আনা সে এক নিহত গোলাপ। কারণ গ্রাম্য বালক ফটিক কলকাতা শহরে এসে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারেনি।এ জগত সংসারে সে সম্পূর্ণ একাকীত্ব অনুভব করেছে। বয়ঃ সন্ধিকালের এই সমস্যাই সৃষ্টি করে অন্তর্মুখীনতা। কিন্তু ফটিকের অন্তর্মুখীনতা কেউ কাটায়নি। বরং ফটিকের বই হারানোর প্রসঙ্গে মামির আচরণ তার

স্বপ্নকে সম্পূর্ণভাবে চূর্ণ করে দিয়েছে। তাই জ্বর হলেও তা সে মামীকে জানায়নি। নিরবে যন্ত্রণা সহ্য করেছে। কখনো ঘোর প্রলাপের মধ্যে বলেছে-

> "মা আমাকে মারিস নে মা, সত্যি বলছি আমি কোন দোষ করিনি।"[৪]

যে মা সন্তানকে নিজের কোল থেকে বিচ্ছিন্ন করে দূরে সরিয়ে দিয়েছিল, শেষে অভিমানী সন্তান মায়ের কাতর অনুনয়েও আর ফিরে তাকায়নি। শুধু বলেছে-

> "ফটিক আস্তে আস্তে পাশ ফিরিয়া কাহাকেও লক্ষ্য না করিয়া মৃদুস্বরে কহিল, মা এখন আমার 'ছুটি' হয়েছে মা, এখন আমি বাড়ি যাচ্ছি।"[৫]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'অতিথি' গল্পটি সাধনা পত্রিকায় ১৩০২ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। গল্পে যে কৈশোর চরিত্রটি আমরা পাই তাহল তারাপদ। গল্পটিতে তারাপদ বনের পাখির মতোই বন্ধনভীরু। পাকের মধ্যে থাকা পাঁকাল মাছের মতোই সে পিচ্ছিল, ধরতে গেলেই পিছলে বেরিয়ে যায়। তার চোখে হরিণ শিশুর মত বিস্ময়। কারও জন্য তার অন্তর কাঁদে না, কারো কাছে সে নিজেকে সমর্পণ করতে শেখেনি। কিন্তু সবাই তাকে ভালোবাসে, পরম নির্ভরতায় বিশ্বাস করে, কাছে পেতে চায়। তারা পদর গৌরবর্ণের সুষ্ঠু দেহ সৌষ্ঠব, দীর্ঘ টানা চোখ ও প্রসন্ন হাস্যময় ওষ্ঠাধারে একটি সুললিত সৌকুমার্য যেন কোন কুশলী শিল্পীর দক্ষ হাতের সৃষ্টি। তার স্বভাব সিদ্ধ মিষ্টি হাসি কাউকে আঘাত করে না। শৈশবের গ্রামীণ জীবনে সে সকলের আদরের ধন। গল্পে তারা পদর জন্ম নক্ষত্র তাকে গৃহহীন করেছে। অন্তরে সে বাউল কিন্তু যাযাবর নয়। শরীর ধর্মে সে মানব সন্তান কিন্তু মানব ধর্মে প্রকৃতির। তাই যখনই সে নদীতে বিদেশি নৌকার জলবিহার, গ্রামের অশ্বত্তলায় বিদেশি সন্ন্যাসী বা নদী তীরে যাযাবর বেদের দলকে দেখত তখনই তার চিত্ত অশান্ত হয়ে উঠতো নতুন কিছু দেখা-জানার জন্য।

সে তার প্রিয়জনদের ছেড়ে ঘর করেছে বাহির কিন্তু বাহিরকে ঘরে পরিণত করেনি। সে হরিণের মতো বন্ধন ভীরু। শৈশবে সে সংগীত সভায় বৌদ্ধার মত মাথা নেড়ে প্রবীণ সমাজে হাস্যরসের সৃষ্টি করত, কিন্তু বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ব প্রাণের প্রবাহমান সংগীত ধারার অনুরক্ত ভক্ত হয়ে উঠেছে।তাই সে সবুজ মাঠ, ছায়া ঘেরা গ্রাম, পাটের ক্ষেত, গ্রামের সংকীর্ণ মেঠোপথে সে অনুভব করে আত্মার বন্ধন। পার্থিব বন্ধন, ভবিষ্যৎ জীবনের স্বপ্ন, স্বার্থের টানাপোড়েন কোন বন্ধনেই তাকে বাঁধতে পারেনি। এই কারণেই বাড়ি ছেড়ে সে প্রথমে যোগ দিয়েছিল যাত্রাদলে সংগীতের আকর্ষণে। আবার এই সংগীতের আকর্ষণই তাকে নিয়ে এলো পাঁচালির দলে। সেখানেও বাধা না পড়ে পাখির মতোই উড়ে এলো জিমন্যাস্টিকস এর দলে। কিন্তু যেই আবার শুনেছে নন্দীগ্রামের জমিদার বাড়িতে যাত্রার দল হয়েছে, ওমনি তার অন্তর বলে উঠেছে-

> "হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোনখানে।"[৬]

গল্পে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তারাপদকে লৌকিক জগতের নয়, বিশ্ব জগতের সন্তান করে তুলেছেন। মতিলালবাবু ও অন্নপূর্ণার স্নেহের বাঁধনেও সে বাঁধা পড়েনি। তাই বর্ষার জল যেমন তীব্র বেগে ছুটে সামনের দিকে এগিয়ে যায় সেরকম তারাপদ কুডুলকাটার রথের মেলায় পণ্যবাহী নৌকার সারি থেকে ভেসে আসা সুরতরঙ্গে ভেসে গেছে কুডুলকাটায়। যেখানে বন্যার জল ছুটে চলেছে সাগরের সন্ধানে।

'আপদ' গল্পের নীলকান্ত, লেখকের ভাষায় তাকে দেখে মনে হত, অনতিপক্ক ১৪ বছরের বালক। সে যাত্রা দলের ছোকরা, ঘাড়ে লম্বা চুল, বড় বড় চোখ, গোঁফের রেখা এখনও ওঠেনি। খুব কম বয়সে সে যাত্রা দলে ঢুকে রাধিকা, দময়ন্তী, সীতা ও বিদ্যাসুন্দরের সখি সেজে দর্শকদের মন জয় করেছে। সে যেন বর্ণচোরা, ভিতরটা কাঁচা, কিন্তু বাইরের হাবভাব ভীষণ পাকা। 'অতিথি' গল্পের তারাপদ মত নীলকান্তও যাত্রা গানে যোগদানের উদ্দেশ্যে পথে বেরিয়েছে। স্থান পেয়েছে কিরণময়ীর সংসারে এক মহা প্রলয়ের মধ্য দিয়ে। গঙ্গাবক্ষে নৌকাডুবি সহযাত্রীর সলিল সমাধি অতিক্রম করে নীলকান্ত সাঁতার দিয়ে তীরে উঠে কোনক্রমে প্রাণ বাঁচিয়েছে। কিরণ তাকে গ্রহণ করেছে খানিকটা দয়া পরাবশ হয়ে, বাকিটা কর্তব্যের অনুরোধে। কিন্তু বাড়ির কর্তা শরৎ ও কিরণের বৃদ্ধ শাশুড়ির কাছে সে অবাঞ্ছিত। শরতের মূল্যবান ও শখের ছাতাটি মাথায় দিয়ে গ্রাম ভ্রমণ, তার গুড়গুড়িতে তামাক খাওয়া, প্রতিবেশীর আম্র কাননের কচি আম ধ্বংস করা ইত্যাদি কাজের মধ্য দিয়ে শেষে সকলের বিরাগভাজন হয়ে পড়েছে। কারণ কিরণময়ীর সমস্ত দৃষ্টি সতীশের প্রতি নিবদ্ধ হওয়ায় নীলকান্ত সতীশকে প্রতিপক্ষ ভেবে ঈর্ষা করেছে

ও সতীশ এর দোয়াতদান চুরি করেছে ও কিরণময়ীর স্নেহের অপমান করেছে। কিন্তু সে যে চুরি করে নি শুধুমাত্র প্রতিহিংসা বসত এ কাজ করেছে তা প্রমাণ করা কিরণময়ীর কাছে দূঃসাধ্য। শৈশবের সুপ্ত বাসনা বিকৃত পথে তার কর্মকে প্রভাবিত করে। গল্পের নীলকান্তর শৈশব কঠিনতম শাসনে অতিক্রান্ত। শৈশবের হীনতম জীবন ধারণকে অস্বীকার করার বাসনার মধ্য দিয়ে তার বিকৃত শৈশব চাপল্য ক্রমান্বয়েই তাকে বাড়ির সকলের কাছে অবাঞ্ছিত আপদ স্বরূপ করে তুলেছে। তাতেই সে অভিমানী হয়ে উঠেছে। তার এই অভিমান আপাতভাবে কিরণময়ীর উপর হলেও, এ অভিমান তার নিজের প্রতি। আপদ অর্থে অবাঞ্ছিত। গল্পটির শেষ প্রেক্ষাপট চিত্রিত করা হয়েছে নীলকান্তর প্রশ্রয় পাওয়া গ্রাম্য কুকুরটির বিবরণ দিয়ে-

> "আহার ত্যাগ করিয়া নদীর ধারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া খুজিয়া খুঁজিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া বেড়াইতে লাগিল।"[৭]

এই কুকুরটি যেন নীলকান্তর অন্তরের প্রতিচ্ছবি রূপে গল্পে চিত্রিত হয়েছে। একটি স্বপ্নকে ফিরে পাওয়ার জন্য পরিত্যক্ত নীলকান্তের ব্যর্থ অনুসন্ধান গল্পটিকে বিশেষ আকর্ষণীয় করে তুলেছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বলাই' গল্পটি সবুজপত্র পর্বের একটি উল্লেখযোগ্য গল্প। গল্পটি ১৩৩৫ বঙ্গাব্দে প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। গল্পটি রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছেন শান্তিনিকেতনে প্রথম বৃক্ষরোপণ উৎসব উপলক্ষ্যে। ওয়ার্ডসওয়ার্থের মতো রবীন্দ্রনাথও প্রকৃতির সন্তান। প্রকৃতির রূপ রস গন্ধ তাকে আকৃষ্ট করত। এজন্য তাঁর পল্লীপ্রীতি ছিল সর্বাধিক। আলোচ্য গল্পটি প্রকৃতিপ্রাণ মাতৃহারা বলাইয়ের প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কের বন্ধনকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। গল্পকার মাতৃহীন এই কিশোরকে প্রকৃতির সন্তানরূপে এঁকেছেন। প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতা এবং তার প্রতি নিবিড় আকর্ষণই বলাই চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। গাছপালার মূল সুর বলাইয়ের প্রাণের সুরে মিশে গেছে। তাই গাছ বলাইয়ের প্রতিরূপ, তার প্রাণের দোসর। প্রকৃতির মধ্যেই বলাই তার প্রাণসত্তার অবাধ মুক্তির সুযোগ পায়। ছেলেবেলা থেকেই চুপচাপ চেয়ে চেয়ে দেখাই তার অভ্যাস। তাই পূর্ব আকাশে যখন কালো মেঘ স্তরে স্তরে জেগে ওঠে তখন সে অবাক হয়ে দেখে। আবার বিকেলে পড়ন্ত রোদ্দুরে গা খুলে বেড়ায় এবং সমস্ত আকাশ থেকে কি যেন একটা সংগ্রহ করে নেয়। কচি পাতার সঙ্গে বলাইয়ের কথোপকথন হয়। কচি পাতার মতনই কচি মন বলাইয়ের। গল্পে বলাইয়ের কাকা তাকে বলেছে-

> "এই ছেলের আসল বয়স সেই কোটি বৎসর আগেকার দিনে, যেদিন সমুদ্রের গর্ভ থেকে নতুন জাগা পঙ্কস্তরের মধ্যে পৃথিবীর ভাবি অরণ্য আপনার জন্মের প্রথম ক্রন্দন উঠিয়াছে- সেদিন পশু নেই, পাখি নেই, জীবনের কলরব নেই, চারিদিকে পাথর পাঁক আর জল।"[৮]

সেই বিশ্ব প্রাণের বাণী নিজের রক্তের মধ্যে শুনতে পেয়েছিল বলাই। তাই সমবয়সীরা গাছের ডাল পাতা ছিঁড়লে বলাইয়ের মন খারাপ হয়, বলাই ঘাসিয়াড়াকে সহ্য করতে পারে না।

কিশোর বলাইয়ের গাছের প্রতি ভালোবাসা থেকেই গল্পের শিমুল গাছটিকে সে যত্ন করে বাড়িয়ে তুলেছে। প্রতিদিন নিজের হাতে একটু একটু করে জল দিয়েছে। সকালে বিকেলে আকুল হয়ে দেখেছে গাছটি কতটা বাড়ল। গল্পটিতে রবীন্দ্রনাথ শিশু মনস্তত্ত্বকে উজাড় করে দেখিয়েছেন। নইলে মাটির নিচের অঙ্কুর গুলির কোঁকড়ানো মাথা পর্যবেক্ষণ করা, শ্রাবণের অরন্যের ভিজে ভিজে গন্ধ কে অনুভব করার মতো চিত্র অঙ্কন করতেন না রবীন্দ্রনাথ। বলাই এর উপলব্ধির স্তর এতটাই গভীর ও ব্যাপক যে ঘাসের আস্তরণকে তার স্থির পদার্থ বলে মনে হতো না, বরং তার মনে হয়-

> "যেন ওই ঘাসের পুঞ্জ একটা গড়িয়ে-চলা-খেলা, কেবলই গড়াচ্ছে। তারই সেই ঢালু বেয়ে ও নিজেও গড়াত- সমস্ত দেহ দিয়ে ঘাস হয়ে উঠত- গড়াতে গড়াতে ঘাসের আগায় ওর ঘাড়ের কাছে সুরসুরি লাগতো আর ও খিল খিল করে হেসে উঠত।"[৯]

রবীন্দ্রনাথ এই গল্পে কিশোর জীবনের প্রকৃতি প্রীতিকেই বলাই চরিত্রের মধ্য দিয়ে আবিষ্কার করতে চেয়েছেন।

রবীন্দ্র ছোটগল্পের প্রথম পর্যায়ের সূচনা মুহূর্তের গল্প হল 'পোস্টমাস্টার' গল্পটি। গল্পটি সৃষ্টির পিছনে রবীন্দ্র জীবনের এক অভিজ্ঞতা কাজ করেছিল। রবীন্দ্রনাথ তখন জমিদারি দেখাশোনার কাজে সাজাদপুরে। ছিন্নপত্রের ৫৯ সংখ্যক পত্রে 'পোস্টমাস্টার' গল্পটি লেখার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে জানা যায়-

> "আমি এঁকে (পোস্টমাস্টার) প্রতিদিন দেখতে পেতুম, তখন আমি একদিন দুপুর বেলায় এই দোতালায় বসে সেই পোস্টমাস্টার গল্পটি লিখেছিলুম।...যাই হোক এই লোকটিকে আমার বেশ লাগে।। বেশ নানা রকম গল্প করে যান, আমি চুপ করে বসে শুনি। ওরই মধ্যে ওঁর আবার বেশ একটু হাস্যরসও আছে।"[১০]

গল্পটির কাহিনী ধারার দিকে দৃষ্টিপাত করলে আমরা দেখতে পাবো পল্লী গ্রামের সহায় সম্বলহীন পিতৃমাতৃহীন বারো-তেরো বছরের বালিকা রতন পোস্টমাস্টারের নিঃসঙ্গ মরুদ্যান স্বরূপ জীবনে একটি পান্থপদপের ন্যায়। উলাপুর গ্রামে রতনের সঙ্গে সাক্ষাৎ না ঘটলে পোস্টমাস্টারকে অনেক আগেই হয়তো বা বদলির জন্য প্রস্তুত হতে হতো। গল্পে আমরা দেখতে পেয়েছি নিঃসঙ্গ পোস্টমাস্টারের জন্য রতনের বিবিধ পরিচর্যা, খেয়াল রাখায় কোন খাদ ছিল না। রতন যে বয়সে তার প্রভুর অকৃত্রিম সেবা যত্ন করে চূড়ান্ত কর্তব্য নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছে। তা হয়তো পোস্টমাস্টারের কাছেও একটি বড় পাওনা ছিল। তাই বালিকা রতনের কর্তব্যের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ আমরা পেয়েছি পোস্টমাস্টারের অসুস্থতার সময়। রবীন্দ্রনাথ লিখছেন-

> "বালিকা রতন আর বালিকা রহিল না। সেই মুহূর্তেই সে জননীর পদ অধিকার করিয়া বসিল, বৈদ্য ডাকিয়া আনিল, যথাসময়ে বটিকা খাওয়াইল, সারা রাত্রি শিয়রে জাগিয়া রহিল, আপনি পথ্য রাঁধিয়া দিল এবং শতবার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, হ্যাঁ গো দাদাবাবু, একটুখানি ভালো বোধ হচ্ছে কি?"[১১]

গল্পটির এই প্রেক্ষাপটে বালিকা রতনের পোস্টমাস্টারের জন্য সেবাপরায়নতা ও অপ্রাপ্তবয়স্কা কিশোরীর ধৈর্য ও আন্তরিকতা পাঠককে কর্তব্য নিষ্ঠারও পাঠ দেয়।

তবে গল্পে আমরা দেখেছি আত্মপরায়ণ পোস্টমাস্টারের হৃদয়ের একটু কোথাও রতনের যাবতীয় গুণাবলী কোন ছাপ ফেলতে পারেনি। আর এজন্যই হয়তো বা পোস্টমাস্টার তার সামান্য জ্বরে চাকরি বদলির সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই খবর যা রতনের কাছে হয়েছে মাথায় বজ্রাঘাতের সমান। তবে সবথেকে ভাববার বিষয় হয়েছে যে রতন পোস্টমাস্টারের থেকে চরম প্রত্যাখ্যাত হয়েও তার সেবা, আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়নি। আর এই জন্যই পোস্টমাস্টারের জন্য নদী থেকে স্নানের জল এনে রেখেছিল তার দাদাবাবু যদি সকালে স্নান করে বাড়ি যান। শেষে উলাপুর গ্রাম থেকে পোস্টমাস্টারের বিদায়, রতনের অবরুদ্ধ বেদনা, পুঞ্জিভূত ক্ষোভ ও অপ্রকাশিত আবেগ প্রকাশিত হয়েছে গল্পে। রতনের বালিকাসুলভ মনোবৃত্তিতে, তাই সে ভাবতে পেরেছে দাদাবাবু বোধ হয় আবার ফিরে আসবে। এরই পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথ গল্পের সংযোজিত করেছেন একটি নিষ্ঠুর মন্তব্য -

> "নদী প্রবাহে ভাসমান পথিকের উদাস হৃদয়ে এই তত্ত্বের উদয় হইল, জীবনে এমন কত বিচ্ছেদ, কত মৃত্যু আছে, ফিরিয়া ফল কি। পৃথিবীতে কে কাহার?"[১২]

সত্যি তাই। আর এর ফলেই রতনের নবজন্ম-ত্রয়োদশী বালিকা ভালোবাসার স্পর্শে ও প্রত্যাঘাতের আঘাতে প্রণয়াতুরা যুবতীতে পরিণত হয়েছে, যার হৃদয় যুক্তি প্রমাণ মানেনা, কেবল ভালবাসতে ও ধরা দিতে চায়। শেষ পর্যন্ত তাই পাঠকের স্মৃতি পটে থেকে যায় স্নেহ ভালবাসা ও আন্তরিকতায় পূর্ণ এক অভাগিনী কৈশোর চরিত্র- রতন।

রবীন্দ্রনাথের 'সমাপ্তি' গল্পটি সাধনা ও ভারতী পর্বের ফসল গল্পটি সাধনা পত্রিকায় ১৩০০ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। প্রকৃতির নিয়মেই মানুষের জীবনে বাল্য, যৌবন ও প্রৌঢ়ত্ব উপস্থিত হয়। আর বাল্য ও যৌবনের মধ্যে এমনিভাবে বয়ঃ সন্ধিক্ষণ আবির্ভূত হয় যা মানব জীবনের পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ সময়। এই সময় ছেলে- মেয়েদের মধ্যে এত দৈহিক ও মানসিক পরিবর্তন হয় যে, তারা দিশেহারা হয়ে পড়ে। এই বয়ঃ সন্ধির সমস্যাই সুন্দরভাবে রূপায়িত হয়েছে মৃন্ময়ী চরিত্রে। আলোচ্য গল্পে মৃন্ময়ীর বয়সের নির্দিষ্ট উল্লেখ না থাকলেও তার দৈহিক গঠন ও হাবভাবের যে বর্ণনা গল্পকার দিয়েছেন, তাতে বোঝা যায় যে বয়ঃ সন্ধিকালের এক মেয়ে। গল্পকার মৃন্ময়ী সম্পর্কে যে বর্ণনা দিয়েছেন তা এরকম-

> "মৃন্ময়ী দেখিতে শ্যামবর্ণ, ছোট কোঁকড়া চুল পিঠ পর্যন্ত পড়িয়াছে। ঠিক যেন বালকের মতো মুখের ভাব। মস্ত মস্ত দুটি কালো চক্ষুতে না আছে লজ্জা, না আছে ভয়, না আছে হাবভাবলীলার

লেশ মাত্র। শরীর দীর্ঘ পরিপুষ্ট সুস্থ সবল, কিন্তু তাহার বয়স অধিক কি অল্প সে প্রশ্ন কাহারো মনে উদয় হয় না।”[১৩]

গল্পে মৃন্ময়ী স্বভাবের মধ্যে কৈশোর বা বয়ঃ সন্ধির বিভিন্ন উদ্বেগ ধরা পড়েছে এভাবে-

> “গ্রামে বিদেশি জমিদারের নৌকা কাল ক্রমে যেদিন ঘাটে আসিয়া লাগে সেদিন গ্রামের লোকেরা সম্ভ্রমে শশব্যস্ত হইয়া ওঠে...কিন্তু মৃন্ময়ী কথা হইতো একটা উলঙ্গ শিশুকে কোলে লইয়া কোঁকড়া চুলগুলি পিঠে দোলাইয়া ‘ছুটি’য়া ঘাটে আসিয়া উপস্থিত। যে দেশে ব্যাধ নাই, বিপদ নাই, সেই দেশের হরিণী শিশুর মত নির্ভীক কৌতূহলে দাঁড়াইয়া চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে থাকে...”[১৪]

গল্পে আমরা দেখতে পাই সহজ সরল হরিণ শিশুর মত চঞ্চল মৃন্ময়ীকে দেখে শহর থেকে আসা যুবক অপূর্ব মুগ্ধ হয় ও মায়ের অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিয়ে করে। কিন্তু মৃন্ময়ী বোঝেনা প্রেম ও বিবাহ কি? যে বয়সে নারী-পুরুষ একে অপরের বন্ধনে আবদ্ধ হতে চায়, মৃন্ময়ীর তখনও সে সময় আসেনি। তাই শাশুড়ির শাসনজনিত সমস্ত রাগ তার গিয়ে পড়ে অপূর্ব উপর।কারণ তার বক্তব্য অপূর্ব বিয়ে করেছে বলেই তার এই বিপত্তি। তাই মৃন্ময়ী পালাতে চেষ্টা করেছে। মৃন্ময়ের মধ্যেও বন্ধন মুক্তির একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় ‘ছুটি’ গল্পের ফটিকের মতো। শাশুড়ির শাসনে আবদ্ধ মৃন্ময়ীকে গল্পকার পিঞ্জরাবদ্ধ পাখির সঙ্গে তুলনা করেছেন। মৃন্ময়ের প্রথম পালানোর পরদিন শাশুড়ি তাকে দরজা বন্ধ করে ঘরে আটকে রাখলে তার তখনকার মানসিক অবস্থা লেখকের বর্ণনায়-

> “সে নূতন পিঞ্জরাবদ্ধ পাখির মত প্রথমে অনেকক্ষণ ঘরের মধ্যে ধড়ফড় করিয়া বেড়াইতে লাগিল।”[১৫]

ভালোবাসার কোনরূপ ভাবনা উদ্রেক না হওয়ায় মৃন্ময়ী অপূর্বর সান্নিধ্যে অকাতরে ঘুমায়। তাই অপূর্বর কলকাতার আইন করতে চলে যাওয়ার কথায় তার মন খারাপ হয় না। বরং রাখালকে ছেড়ে যেতেই মন বেশি কাঁদে। কিন্তু বিধাতার সূক্ষ্ম তরবারির আঘাতে একসময় তার জীবনচক্রের বাল্য অংশ যৌবন থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়। শেষে বাল্য যৌবনের সন্ধিক্ষণের ঝড়ঝঞ্ঝা পেরিয়ে মৃন্ময়ী যুবতী নারীতে পরিণত হয়। গল্পকারে কথায়-

> “যৌবনোদ্গমে মৃন্ময়ীর কাছে শ্বশুরগৃহ নিজের জায়গা মনে হল, অপূর্বর কাছে কলকাতায় চলে যাবার জন্য সে উদগ্রীব হয়ে উঠলো।... সে মনে মনে বলিতে লাগিল, আমি তোমাকে বুঝিতে পারি নাই বলিয়া তুমি আমাকে বুঝিলেনা কেন। তোমার ইচ্ছানুসারে আমাকে চালনা করাইলে না কেন।”[১৬]

বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের লেখা কিশোরদের উপযোগী গল্পগুলি এক অনবদ্য সৃষ্টি। আমাদের ইচ্ছাপূরনের একমাত্র অবলম্বন। কৈশোরের স্বপ্ন বিভোরতা তারুণ্যের উদ্দীপনায় কিছুটা ঢাকা পড়ে গেলেও স্বপ্ন নিয়েই আমরা বাঁচি। বাস্তবের কঠিন আঘাতে সেই স্বপ্ন কালক্রমে বিবর্ণ হয়। চলার পথে জমে বেদনার গাঢ় কুয়াশা। ঠিক তখনই বড় বেশি মেশিন মায়াতে সেই জপে কালক্রমে বিকার বাচতে শেখায়। কারণ ঐসব ফটিক, তারাপদ, গিরিবালা, রতনরা জানে এগিয়ে চলাই জীবন-

> “দিবা রাত্রি পার হয়ে, জন্ম মরন পার হয়ে মাস, বর্ষ, মন্বন্তর, মহাযুগ পার হয়ে চলে যায়... তোমাদের মর্মর জীবন-স্বপ্ন শ্যাওলা-ছাতার দলে ভরে আসে, পথ আমার তখনও ফুরোয় না...চলে...চলে...এগিয়েই চলে...”[১৭]

রবীন্দ্র ছোটগল্পে উল্লিখিত কৈশোর চরিত্রগুলি উত্তর জীবনের সেই সম্ভাবনাকেই ধারন করে আছে।

তথ্যসূত্র:

1. গিরি, ড. সত্যবতী ও মজুমদার, সমরেশ (সম্পা)। প্রবন্ধ সঞ্চয়ন, দ্বিতীয় খণ্ড। রত্নাবলী, ১৯৯৭, কলকাতা, পৃ: ৭১১।
2. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। গল্পগুচ্ছ। শুভম্, ২০০৭, কলকাতা, পৃ: ১১৫।

3. তদেব, পৃ: ১১৫।
4. তদেব, পৃ: ১১৭।
5. তদেব, পৃ: ১১৭।
6. চট্টোপাধ্যায়, সত্যচরণ। গল্পগুচ্ছে রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছ। প্রজ্ঞাবিকাশ, ২০১৪,কলকাতা, পৃ: ৯৯।
7. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। গল্পগুচ্ছ। শুভম্, ২০০৭, কলকাতা, পৃ: ২৩২।
8. তদেব, পৃ: ৬৪৬।
9. তদেব, পৃ: ৬৪৫।
10. আচার্য্য, ড. দেবেশ কুমার। গল্প মণিহার। ইউনাইটেড বুক এজেন্সি, ২০১৪, কলকাতা, পৃ: ৪৭।
11. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। গল্পগুচ্ছ। শুভম্, ২০০৭, কলকাতা, পৃ: ২১।
12. তদেব, পৃ: ২২।
13. তদেব, পৃ: ১৫৯।
14. তদেব, পৃ: ১৫৯-১৬০।
15. তদেব, পৃ: ১৬৪।
16. তদেব, পৃ: ১৬৯।
17. গঙ্গোপাধ্যায়, অধ্যাপক দুর্গাপদ ও দে, অধ্যাপক সুনীল কুমার (সম্পা)। পথের পাঁচালী যুগ্ম সমীক্ষা। গ্রন্থবিকাশ, ২০১৮,কলকাতা, পৃ: ২০৮।

গ্রন্থপঞ্জি:

আকর গ্রন্থ :

১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। গল্পগুচ্ছ। শুভম্, ২০০৭, কলকাতা।

সহায়ক গ্রন্থ:

1. মুখোপাধ্যায়, অরুণ কুমার। কালের পুত্তলিকা, বাংলা ছোটগল্পের একশো বিশ বছর ১৮৯১-২০১০।দে’জ পাবলিশিং, ২০১৬, কলকাতা।
2. চৌধুরী, শ্রী ভূদেব। বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার। মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৪, কলকাতা।
3. রায়, সিংহ গোপীমোহন। রবীন্দ্র সাহিত্যে নরনারী, দ্বিতীয় খণ্ড। ভারবি, ১৩৭৯, কলকাতা।
4. গিরি, ড. সত্যবতী ও মজুমদার, সমরেশ (সম্পা)। প্রবন্ধ সঞ্চয়ন, দ্বিতীয় খণ্ড। রত্নাবলী, ১৯৯৭, কলকাতা।
5. চট্টোপাধ্যায়, সত্যচরণ। গল্পগুচ্ছে রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছ। প্রজ্ঞাবিকাশ, ২০১৪,কলকাতা।
6. আচার্য্য, ড. দেবেশ কুমার। গল্প মণিহার। ইউনাইটেড বুক এজেন্সি, ২০১৪, কলকাতা।
7. আচার্য্য, ড. দেবেশ কুমার। প্রবন্ধ বিচিত্রা। প্রজ্ঞাবিকাশ, ২০১২, কলকাতা।